হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১০, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের প্রাণ। হিন্দুত্বই ভারতবর্ষের জাতীয়তা। হিন্দুত্বকে যত পরিমাণে কমিয়ে আনা যাবে তত প্রদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতা বাড়ানো যাবে। হিন্দুত্ব শূন্য মানুষকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করানো যাবে।"

—শিবপ্রসাদ রায়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মরুদ্যান পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ	স্থান	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৬/১২/০৯	বসিরহাট থানা	কচুয়া, মা কল্যানময়ী কালিমন্দিরের গহনা চুরি ও পরে তার মূর্ত্তি পুড়িয়ে এবং সবশেষে প্রতিমার একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে।
১৮/১২/০৯	মীনাখা থানা	দেবীতলা, মুসলিমরা জোর করে আদিবাসীদের খেলার মাঠের উপর দিয়ে জোর করে খাল কেটেছে।
৩০/১২/০৯	বেড়াচাঁপা	একটি মুসলিমের লরিচাপাকে কেন্দ্র করে এলাকায় হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর করা হয়। কিন্তু মুসলিম দোকানগুলি অক্ষত থাকে।
জুলাই-০৯	বনগাঁর এড়োপোতা	মিহির মণ্ডলের ৩২শতক জমি মুসলিমেরা দখল করে নিয়েছিল। ২১শে অক্টোবর হিন্দু সংহতির কর্মীরা সেটি মালিককে ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হয়। অবশ্য তার জন্য হিন্দু সংহতির কর্মীদের কারাবরণও করতে হয়।
	ব্যারাকপুর	পৌরসভা, ৩নং ওয়ার্ড বিধানপল্লী, ৬০ বছর ধরে নবারুণ বিদ্যামন্দির নামে সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ভগ্নস্তূপ একটি ইটের কাঠামোকে ১০০% হিন্দু বসতির মাঝখানে মসজিদ বানানোর প্রচেষ্টা।
	হাসনাবাদ	হাসনাবাদ টাকী পৌরসভার বিভিন্ন ক্লাবের কালীপূজায় সাঁকচূড়ার মুসলিম ছেলেদের নিয়মিত অত্যাচার।
	খড়দহ	পি. কে. বিশ্বাস রোড, মুসলিম দুষ্কৃতিদের দ্বারা দূর্গাপ্রতিমা ভাঙা।
ফেব্রুঃ ০৯	সন্দেশখালি থানা	ভাটিদহ গ্রাম, ১৪ বছরের নয়না সরদারকে অপহরণ করে রফিকুল শেখ। উদ্ধারের পর আবার অপহরণ। পুলিশ প্রশাসন উদ্ধার করতে পারেনি।
	সন্দেশখালি থানা	সরবেড়িয়ার কারিপাড়া গ্রাম, কানু সরদারের বাড়ী আগুন দিয়ে সবকিছু ভস্মীভূত করে দিল মুসলিমরা।
২/৩/০৯	ভেবিয়া	৬/৭টি ক্রিমিনাল কেস থাকা ও রিভলবার দেখিয়ে নিত্য তোলাবাজি করা এক মুসলিম দুষ্কৃতির জনরোষে মৃত্যু হলে তার পাড়ার ৬০/৭০ জন মুসলিম এসে ভেবিয়া বাজারে বেছে বেছে হিন্দু দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাঠ চালায়।
২৫/২/০৯	মীনাখা থানার	মহানিমতলা শ্মশান, প্রতি বছর এখানে শিব ও কালীপূজা হয় ও তারপর প্রতিমা বিসর্জনের সময় চৈতল অঞ্চলের মুসলিমদের বাধাদান।
২/৩/০৯	বারাসাত	কদম্বগাছি গ্রাম, বাংলাদেশ থেকে আসা দরিদ্র হিন্দুরা এখানে কলোনি বানিয়ে থাকেন। তাদের উপর চলে বারবার মুসলিম অত্যাচার। এবারের অত্যাচারে অনেকেই ঘরছাড়া, মহিলারাও আক্রান্ত।
৪/১/০৯	মীনাখা থানার	বরোদাবাদ গ্রাম, মুসলিম ভোটলোভী তৃণমূল কংগ্রেসীদের উস্কানিতে গোবরডাঙায় হিন্দু সংহতির প্রশিক্ষণ শিবির ফেরৎ কর্মীদের উপর মুসলিমদের আক্রমণ।
দূর্গাপূজা	নোদাখালি থানার	প্রতিবছর দূর্গামণ্ডপের সামনে ঈদের গেট করেও সেটি রেখে দেয়। বিড়লাপুর মোড়ে এবছরও সেটি রেখে দেওয়া হয় নতুন কায়দায়।
২৩/৯/০৯	ভাঙড় থানা	সুন্দিয়া ও অশ্বত্থবেড়িয়া গ্রাম, দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রামের হিন্দুদের উপর ভয়ভীতি, আঘাত, সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু মুসলিম যারা এলাকায় সুন্দিয়ার মোড়টিকে সাট্টা, মদ, গাঁজার আখড়ায় পরিণত করেছে।
জুন ০৯	জয়নগর থানা	পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুল, টিফিনের সময় ১ ঘণ্টা ও স্কুলের মধ্যেই নামাজ ঘরের দাবী জানিয়ে হিন্দুদের আক্রমণ। বহু হিন্দু আহত, বাড়ী লুঠ ও মেয়েদের শ্লীলতাহানি।
১৩/৫/০৯	উস্থি	ভোটের দিন রাতে পিঁয়াজগঞ্জ মসজিদ নির্মাণ হল পুলিশের সহযোগিতায়।
৬/৩/০৯	জয়নগর থানা	দক্ষিণ বেলেগ্রাম, নাবালিকা সুস্মিতাকে অপহরণ করল মুসলিম গুণ্ডারা।
	বিষ্ণুপুর থানা	১ নং ব্লকের কেওড়াডাঙা শ্মশান, শ্মশানের পাশে থাকা একটি ফ্যাক্টরির মুসলিম মালিক অন্যান্য মুসলিমের সহযোগিতায় শ্মশানের জমি দখলে সামিল হয়েছে।
৩১/১২/০৮	ক্যানিং	ক্যানিং ১ নং ব্লকের বিডিও প্লাবন গোস্বামী সপরিবারে লঞ্চে ভ্রমনের সময় মুসলিমেরা লুটপাট চালায়। এই নদীপথেই বাংলাদেশের সাথে চোরাচালান ও অস্ত্র আমদানী করে মুসলিমেরা।
বিজয়াদশমী	মগরাহাট	মগরাহাট সবাই জানে মিনি পাকিস্তান, দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুরা অত্যাচারিত। এবারে ১৫টি সংগঠন দুর্গা প্রতিমার অকুতোভয়ে নিরঞ্জন করে ঐ স্থানকে নয়া হিন্দুস্থান বানিয়েছে। ফলে হিন্দুদের নিত্য হুমকি জুটছে।
২৯/১০/০৯	পার্ক সার্কাস	জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের সময় শোভাযাত্রা আক্রান্ত এবং মুসলিম দুষ্কৃতিরা ভাঙল তিনটি হিন্দু মন্দির।
৭/২/০৯	কলকাতা	স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা কার্যালয়ে, লণ্ডনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের পুর্নমুদ্রনের জন্য চারদিন ধরে ঐ কার্যালয়ের সামনে ও ধর্মতলা চত্বরে রাস্তা অবরোধ এবং ওদের দাবীমত পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হল।
২৮/৯/০৯	রামপুরহাট	মহাজনপট্টি, ১০টি ক্লাবের দুর্গাপ্রতিমার হিন্দু শোভাযাত্রার উপর বগটুই গ্রামের মুসলিমদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ।
৩০/৯/০৯	মল্লারপুর	রুকুনপুর গ্রামের প্রচুর মুসলিম মল্লারপুরের মেঘদূত ক্লাবে দূর্গাপুজার বিসর্জনের শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ করে।
২৪/২/০৯	রামপুরহাট	শ্যামল দাসের বাড়ীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৬/৭ জন মুসলিম যুবকের ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় মুসলিম পাড়া থেকে ৪০/৫০ জন মুসলিম যুবক তাণ্ডব করে। প্রদর্শনীর সব মূর্তি ও সমস্ত পূজামণ্ডপ ভেঙে দেয়।
১৩/১২/০৯	জগৎবল্লভপুর থানা	মানিকপীর গ্রাম, মুসলিম ছাগলচোরকে হিন্দুরা ধরে। বদলা নিতে কয়েক হাজার ইসলামপুর অঞ্চলের মুসলিমের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ হিন্দু গ্রামে। পরিণামে ১৪ জন হিন্দুকে গ্রেফতার ও ২৪ জনের নামে কেস।
২৮/১১/০৯	বনহরিশপুর হাইস্কুল	জোর করে নবীদিবস পালন। সুজয় ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন হিন্দু গ্রেপ্তার।
জুলাই ০৯	হাটগাছা-২পঞ্চায়েত	বাড়বেড়িয়া গ্রাম, হিন্দু বাগান জোরপূর্বক দখল। হিন্দুদের প্রতিরোধ ও পুনর্দখল। বোমাবাজির মাধ্যমে পুনরায় মুসলিম দখল। অর্পিতা প্রামাণিককে জেলে পোরা ও বেশ কিছু হিন্দুর নামে কেস।
২৬/৯/০৯	বাগনান	তিনজন মুসলিম যুবক মোটর সাইকেলে যেতে যেতে এক হিন্দু যুবককে ধাক্কা মারে। প্রতিবাদী হিন্দু যুবকটি তারপর ঐ মুসলিম যুবককে রাস্তায় ফেলে পেটায়। বিশ্বকর্মা পূজার দিন আদিবাসী মেয়েরা প্রতিমার সামনে নাচছিল। কিছু মুসলিম যুবক ওদের সাথে নাচের আছিলায় ওদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। দুর্গাপূজার নবমী খাদিনান মোড়, পাঁচলা থেকে ঠাকুর দেখতে আসা হিন্দু মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি করে মুসলিম যুবকেরা। হিন্দুরা প্রতিকার করে।
২২/৯/০৯	বাগনান	B.D.O. অফিস, সঙ্ঘবদ্ধ মুসলিমেরা পাইকপাড়ি গ্রামে রাস্তাকে কেন্দ্র করে জনসমক্ষে B.D.O.-কে মারধর করে।
৯/১০/০৯	আমতা থানা	খেজুরতলা গ্রাম, ভাণ্ডারগাছা, পুকুরে স্নান করতে থাকা ভোলাবাবুকে অকারণে মারধোর করে। গুরুতর জখম ও ছাড়াতে আসা তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা।
৪/৩/০৯	চেঙ্গাইল	মহরমের দিন তাজিয়া নিয়ে বেরিয়ে হিন্দুর শনিমন্দিরের চাল ভেঙে দেওয়া ও পরে হিন্দুদের বাড়ী পুড়িয়ে সমস্ত কিছু, এমনকি সমস্ত শাড়ীও নিয়ে গেল মুসলিমেরা।
৮/১১/০৯	উলুবেড়িয়া	৩০টি ক্লাবের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে ভক্তার মোড়ে আটকে দেয় মুসলিমেরা। পুলিশ সেই প্রতিমাকে জোর করে খালে ফেলে দেয়।
আগস্ট, ০৮	শিবপুর	অভিজাত এলাকা পদ্মপুকুর, রমজান আলি নিয়মিত ঘোষবাগানে এসে হিন্দু মেয়েদের কুৎসিত ইঙ্গিত করত। সাহসী দূর্গা সিং রুখে দাঁড়াতে এসব বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তাকে আহত করে ওরা মৃতবৎ ফেলে গিয়েছিল।
১৫/১১/০৯	জাঙ্গীপাড়া	তৃণমূলের বিজয় মিছিলে ৮০% মুসলিমরা বোড়হল, নিকাশ, খুঁড়িগাছি দিলকাস এলাকা দিয়ে যেতে যেতে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে আর বলে 'মুসলিম সন্ত্রাসের চিহ্ন হিন্দুদের শরীরে এঁকে দিলাম'।
২৮/১২/০৯	চণ্ডীতলা	৯১ বছরের দুধকল্মী বারোয়ারী দূর্গাপূজার নিরঞ্জনের সময় নবাবপুর অঞ্চলের চককৃষ্ণরামপুরের কয়েক শ মুসলিম রাস্তায় শুয়ে পড়ে নিরঞ্জনে বাধা দেয়।
১০/০৭/০৯	বেলডাঙ্গা	নওদা , ঝাউবোনা হাইস্কুলে টিফিনের ছুটি ১ ঘণ্টা ও স্কুলেই নামাজ পড়ার দাবী জানিয়ে মুসলিমরা তাণ্ডব ও এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। পুরো গ্রাম লুট ও অগ্নিসংযোগ।
৭/৬/০৯	ছাতনী	বর্ধমান জেলার বুড়োরাজের মেলায় তীর্থযাত্রীদের উপর সশস্ত্র মুসলমানদের আক্রমণে জামালপুর গ্রামের বেশ কিছু হিন্দু মৃত ও ১০০-র বেশী আহত।
১৮/১০/০৯	শান্তিপুর	মালোপাড়া, কালীপ্রতিমার শোভাযাত্রায় আক্রমণ করে মুসলিমেরা, দা দিয়ে প্রতিমার হাত কাটে ও প্রতিমার পাঁচভরি সোনার গহনা লুট করে।

আমাদের কথা

১৪ই ফেব্রুয়ারীর হিন্দু সমাবেশ
এক আশার আলো

বাংলার চারিদিকে আগ্রাসী শক্তি বিস্তার লাভ করছে। রাজ্যের বিরাট সংখ্যক শান্তিকামী, মানবতাবাদী ও উদার জনসমষ্টির মানুষকে রক্তপাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিভিন্ন ব্লক ও জেলা থেকে মানুষ দ্বিতীয়বার রিফিউজি হচ্ছে আরবীয় সংস্কৃতির মানুষের ধাক্কায়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ হবার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। '৪৭ সালে এক বঙ্গ আর এক বঙ্গের হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছিল। বাঙালিদের যাবার জন্য এবার আর তৃতীয় বাংলা নেই। তাই এবার এদের পরিত্রাণ কোন্ পথে?

১৯০৫ সালে বাংলাকে বিভাজন করতে চেয়েছিল বৃটিশ। তাদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গকে রদ করা গিয়েছিল। কিন্তু, ১৯৪৭ সালে যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন বাংলাকে বিভাজনের হাত থেকে কেউই বাঁচাতে পারল না। অখণ্ড বাংলা খণ্ডিত হল। কারণ ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ও নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন যজ্ঞ, যার সামনে মোকাবিলা করার জন্য কেউ দাঁড়াতেই পারল না। অপরদিকে, ক্ষমতা দখল, মুসলিম তোষণ, ভোটভিখারী রাষ্ট্রপরিচালকদের দেশবিরোধী শক্তির নিরন্তর তোষণের মানসিকতা। তাই আমরা আমাদের বাংলাকে বাঁচাতে পারিনি, দেশকেও পারিনি। পরিণামে বিভাজন আর রিফিউজী, (হিন্দু) নারী ধর্ষণ, হিন্দু দেবদেবীর অপমান। তাই চিন্তা— এ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি? কিভাবে রাজ্য, দেশ এই দুরাচারী অশুভ শক্তির করাল কবল থেকে মুক্ত হয়ে আবার শক্তিশালী হতে পারবে?

সেদিন যে মহান শক্তিধর নেতৃত্ব শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর চেষ্টায় এই পশ্চিমবঙ্গ নামক ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্যটি পেলাম সেটাকে আবার বাংলাদেশে পরিণত করার সম্পূর্ণ প্রয়াস চলছে। চালাচ্ছে মুসলমান, কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট। বাংলাদেশ হলে তার পরিণতি নতুন করে বোঝানোর প্রয়োজন হবে না। যেই বাংলাতে মুক্তমনের শান্তি কামী মানুষের বসবাস করার অধিকার থাকবে না। মুসলমান হলেও না। তাই লেখিকা তসলিমার যেমন জায়গা হয় না, সালাম আজাদেরও না। আর হুমায়ুন আজাদকে দেশের বাইরে গিয়ে হত্যা করে অতিমাত্রার মুসলমান আততায়ীরা। তাই দুঃখ করে তিনি বলেছিলেন, "১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টি করি একটি স্বাধীন দেশ ঃ বাঙলাদেশ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধকারের শক্তিরাশি আমাদের সামনের দিকে এগোতে দেয়নি, বরং নিয়ে চলেছে মধ্যযুগের দিকে ঃ বাঙলাদেশকে ক'রে তুলছে একটি অপপাকিস্তান। মৌলবাদ এখন দিকে দিকে হিংস্ররূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে ঃ ত্রাসে ও সন্ত্রাসে দেশকে আতঙ্কিত ক'রে তুলছে।" (পাক সার জমিন সাদ বাদ)। সেই বাংলাদেশে স্থান হয়নি তথাকথিত মহান সব ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের। জ্যোতিবসু, বুদ্ধদেব, বিমান, কান্তি গাঙ্গুলী, প্রশান্ত শূর, প্রিয়রঞ্জন, মমতা, ত্রিকালদর্শী, সকল গুরুদের যাঁরা বিশ্ব চরাচর কীটপতঙ্গ সকলের শান্তিকামনা করেন। একটা পিঁপড়েও মারেন না সেই সকল বাবা লোকনাথ, ঠাকুর বালক, রামঠাকুর, অনুকূল ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, প্রণবানন্দজী মহারাজ, মা আনন্দময়ী, মহানামব্রত কারোর নয়। আর তাঁদেরই সদস্য আর শিষ্যরা এই পশ্চিমবঙ্গকে আবার বাংলাদেশে পরিণত করার হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় বলা তো দূর অতিমাত্রায় নিরপেক্ষ থাকতে চাইছেন। বাংলার বিপদ দেখেও সকলে চুপ। নেতাদের ভোটের চিন্তা থাকলেও সাধু, সন্ত, কবি, সাহিত্যিকরা চুপ কেন?

দেশ বিভাজনের পরে বাংলাদেশে শতকরা ২৯ জন হিন্দু ছিল, আর আজ সেখানে ৯ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার ২০ শতাংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসলেও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২০০১ সালে গণনায় দেখা যাচ্ছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উঃ দিনাজপুর মুসলিম বহুল। তথা পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালের জনগণনায় হিন্দুর সংখ্যা ৭২.৪৭% যেখানে ১৯৭১ সালে ছিল ৭৮.১১%। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এক বৃহত্তর বাংলাদেশের চক্রান্ত চলছে। এত হিন্দু রিফিউজী আসা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর অনুপাত এত কমে যাচ্ছে কেন? কারণ সেদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি না থাকলে এই পশ্চিমবঙ্গটা থাকত না, আর এখানে যারা রাজনীতি করে আর বুদ্ধি বিক্রি করে বা গুরুগিরি করে খাচ্ছে তারা যেত কোথায়? এরা সকলেই সেই শ্যামাপ্রসাদকে ভুলে গেছে। আর যদিও বা কেউ মুখে ভুল করেও তাঁর নামটা স্মরণ করে থাকেন তবে সাম্প্রদায়িক বিশেষণটা যোগ করতে ভুল করেন না। কিন্তু একজন হলেও এই পঞ্চান্ন বছরে শ্যামাপ্রসাদের মূল্যায়ণ করেছেন, তাঁর দূরদর্শিতার অনুভব করেছেন এবং এতদিন পরে হলেও শ্যামাপ্রসাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তিনি বর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবী আবদুল গফ্ফর চৌধুরী। তাঁর কথায়—

"একসময় আমি যুক্ত বাংলার থিয়োরিতে দারুণভাবে বিশ্বাসী ছিলাম। এই যুক্ত বাংলা যাতে না হয় সেজন্য প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এজন্য তাঁর প্রতি আমার তীব্র বিদ্বেষ বিরূপ মনোভাব ছিল। আমার বহু লেখায় আমি তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ত্রিশ বছর পর আজ আমি শ্যামাপ্রসাদের দূরদৃষ্টিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তিনি হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ভারতভাগের প্রাক্কালে যে কাজটি করে গেছেন, তাতে অবিভক্ত বাংলার একটি অংশে (পশ্চিমবঙ্গ) অন্তত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা পেয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার দানবকে সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে পরাভূত করা সম্ভব হয়েছে। ভারতে যদি আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে স্বাধীন হওয়ার সাড়ে তিন বছর পরেই ফৌজি শাসক ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত বাংলাদেশের নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের এমনকী ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মুসলমান রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীদের আত্মরক্ষার ও আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় কোনও নিরাপদ ভূমি থাকত না।" (২৭/৩/০৫ দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান)

বাংলার কোণে কোণে আজ আবার সেই ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় এপিসোড শুরু হয়েছে। ২১ নভেম্বর ২০০৭ কলকাতায় পার্ক সার্কাস থেকে সেই প্রকরণের অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছিল শিক্ষিত, আর্থিকভাবে সম্পন্ন, কংগ্রেস নেতা ইদ্রিস আলী তসলিমাকে বিতাড়নের মাধ্যমে। সেদিন কলকাতাবাসী যে আগুন দেখেছিল তা থামাতে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনাবাহিনী নামাতে হয়েছিল। ইসলামিক এই বর্বরতার সামনে বুদ্ধবাবুরা মাথা নত করেছিল। তারপরও অনেক ঘটনা ঘটে চলেছে। নির্বাক সংবাদপত্র। কলম বন্ধ বুদ্ধিজীবীদের। কোর্টের আইনও আর আইন থাকছে না। বাংলার জেলাতে জেলাতে ব্লকে গ্রামে নিঃশব্দে সন্ত্রাস আর হিন্দু বিতাড়ন, উৎপীড়ন চলছে। তাদের পাশে দাঁড়াবে কে? ঘটে যাওয়া এই সকল ঘটনার অন্তর্তদন্ত করবে কে? হিন্দু-মুসলিম কোন ঘটনা ঘটলেই সাম্প্রদায়িক বলে চেপে যাওয়া হয়।

জয়নগর খাকুরদহের হরিসাধন বাবাজী সকালে উঠে কৃষ্ণনাম জপ করতেন। শান্তির ইসলাম পন্থীরা তাঁকে বারণ করলেও না শোনায় তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। রামপুরহাট, মল্লারপুরে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন ও শোভাযাত্রা আক্রান্ত হয়। খড়দহে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙা হয়। হোটরে দুর্গাপূজা বন্ধ করার জন্য ক্লাবকে আক্রমণ করে। পার্কসার্কাস থেকে গোবরা এলাকাতে জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জন আটকে দেওয়া হয় প্রতিমা ভাঙা হয়। বর্ধমান বুড়োরাজের মন্দিরে ভক্তদের উপর আক্রমণ করা হয়। বনগাঁ, বাগনান, শান্তিপুর, উস্থির ডিহিকলস সর্বত্র হিন্দুর জমি দখলের চেষ্টা।

দেবোত্তর সম্পত্তি মন্দির দখলকে কেন্দ্র করে আক্রমণ করা হয় হিন্দুদের সে আমতার নরিট হোক আর কলকাতার ট্যাঙরা হোক। সরকারী জায়গাতে পাকা মাজার তৈরী হয়, আর মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়। কচুয়ার কাঁকড়া কালী মন্দিরের মূর্তিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, অলঙ্কার চুরি করা হয়। গ্রামে গ্রামে হিন্দু নারী অপহরণ, ধর্ষণ, জোর করে নাবালিকাদের বিয়ে করা হয়, হাইকোর্ট তাকে বৈধতা প্রদান করে। বানতলা, ধানতলা, ঘোকসাডাঙা, হেমতাবাদ, বহরমপুরের নাবালিকা অনিতা রায়, পশ্চিম মেদিনীপুরে মৌমিতা চক্রবর্তীকে, শাহিদুল শেখ, আজিত আলিকে কোর্ট শাস্তি দেয় না। সন্দেশখালির নয়না সরদারকে অপহরণ করে শেখ সারিফুল মোল্লা, জয়নগরের সুস্মিতা নস্করকে হারিয়ে যায় কেউ এদের খোঁজ করে না। ভালবেসে রিজানুর আত্মহত্যা করলে পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের শাস্তি হয়, মেয়ের বাবাকে জেল খাটতে হয়। ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়ার প্রধান খবর হয় বছরের পর বছর, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ সকলেই কেঁদে পদ্মানদী তৈরি করে। কিন্তু বারাসতের অর্ক ব্যানার্জী ভালবেসে মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে তাকে জীবন্ত গাছে বেঁধে কেরোসিন তেল দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়। বহরমপুরে শৈলেন্দ্রকে একই অপরাধে ধড় থেকে মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। হিন্দু ছাত্রীর ইজ্জত বাঁচাতে ড্রাইভার বিনোদকে গুলি খেতে হয়। মুর্শিদাবাদ আদিবাসী ছাত্রী হোস্টেলে বিধর্মীদের অত্যাচারে হোস্টেল খালি হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদের একরক্ষী গ্রাম হিন্দুশূণ্য হয়ে যায়। দঃ ২৪ পরগণার মগরাহাট ব্লকের হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে যায়। দঃ ২৪ পরগণার ভাঙ্গড় থানার তপশিলি হিন্দুরা এস. ডি. পি. ওর কাছে দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলিম অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে আবেদন জানায়। উঃ ২৪ পরগণার ধুতুরদহ গ্রামের আদিবাসীদের খেলার মাঠ দখল। এরকমই বাংলার, মাঠ, মাটি, মন্দির, মা, মানবতা, সবই দখল হয়ে যাচ্ছে বাঁচাবে কে? আজ স্বামী প্রণবানন্দজীও নেই শ্যামাপ্রসাদও নেই যে ডেকে আশীর্বাদ করে হিন্দুকে বাঁচাতে বলবে। তাই আজ হিন্দুরা গ্রামে গঞ্জে ছোট্ট হিন্দু সংহতিকে বাঁচার প্রতীক হিসাবে আঁকড়ে ধরছে। তাই সিপিএম, কংগ্রেস, টিএমসি, আরএসপি, বিজেপি, বাবাজী যে যাই করুক সকলেই আঁকড়ে ধরছে হিন্দু সংহতিকে। সংগঠন, মঠ, মিশন অনেক আছে। তারা তাদের সংগঠনকে বড় করছে কিন্তু সংঘর্ষ করছে না। আমরা শান্তির কথা যতই বলি না কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সংঘর্ষ করতেই হবে। ধর্ম করলেই হবে না ধর্ম রক্ষা করতে হবে। সেই ধর্ম রক্ষা দেশরক্ষার কাজই করছে হিন্দু সংহতি। গ্রামে গ্রামে হিন্দু সংহতির সেই গ্রহণযোগ্যতারই প্রতিফলন হবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, বিশাল হিন্দু সমাবেশে।

২৬শে জানুয়ারী গোবরডাঙ্গায় হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে ১০০ মেয়েদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তপন ঘোষ, নিত্যরঞ্জন দাস, সুনীল মুন্সী ও স্থানীয় পৌরপিতা জগদীশ সরকার।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের জন্য চাকরীতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ভারতের সংবিধান বিরোধী। আমরা এই অবৈধ মুসলিম তোষণকারী পদক্ষেপ মেনে নেবো না। আইনী প্রতিকার ছাড়াও এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা করা হবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার হিন্দু সমাবেশ থেকে।

আমার মা-বাবা

তপন কুমার ঘোষ

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী আমার মা আমাদেরকে ছেড়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ১৯৯৭ সালে বাবা চলে গেছেন, তখন আমি সংঘ শিক্ষাবর্গে। সারা জীবন নিজের মা-বাবার কোন সেবা করিনি। মা-বাবার এমনই সুসন্তান আমি। তার জন্য মনের মধ্যে চাপা কষ্ট খুব হয়। প্রকাশ করি না। কিন্তু যখন ভাবি কেন এমন হল? মা-বাবার এমন কুপুত্র কেমন করে হলাম? আমার মা বাবা তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন! কোনদিন কারোর অমঙ্গল কামনা করেন নি। সারা জীবন নিজেরা অপরীসীম ত্যাগ স্বীকার করে সমস্ত কর্তব্য করেছেন, যেখানে কর্তব্য নেই সেখানেও সকলের উপকার করেছেন। আমাদের কলকাতার ছোট্ট বাসাবাড়ীতে অতিথি নেই এমন দিন খুব কমই হত। তাই আমরা ভাই-বোনেরাও (১+৩) ছোটবেলা থেকেই বহু মানুষ নিয়ে থাকতে অভ্যস্ত।

আর আজকে আমি যা, তা তো মা-বাবার থেকেই পাওয়া। বাবার জ্ঞানস্পৃহা আর মায়ের মানুষের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা, সকলের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাওয়া, পরিচালন ক্ষমতা ও যুক্তিবাদিতা, এবং উভয়েরই কোন অবস্থাতেই কোন স্বার্থেই কোন নীচ কাজ না করা, সর্ব অবস্থাতেই মনুষ্যত্বকে ধরে রাখা— এইসব গুণের ক্ষুদ্রাংশ যদি আমি মা-বাবার কাছ থেকে না পেতাম তাহলে কি আমি আজকের আমি হতে পারতাম? তারপর আমার জীবনে আদর্শবাদের অঙ্কুরোদ্গম করেছেন শ্যামাদা, বিকাশদা, কেশবজী, রথীনদা, বংশীদা এবং আরও অনেকে। কিন্তু আজ আত্মবিশ্লেষণ করে বুঝতে পারি, মনুষ্যত্বের আদর্শ পেয়েছি মা-বাবার কাছ থেকে, আর রাষ্ট্রীয় আদর্শ পেয়েছি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ থেকে। সংঘ আমাকে দিয়েছে জাতীয় আদর্শ ও এক্সপোজার এবং কাজ করার সুযোগ। আজও ডাক্তারজী (ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার) আমার জীবনের ধ্রুবতারা। ডাক্তারজীর বাণী খুব কম। তাই ডাক্তারজীর বাণী নয়, তাঁর জীবনকে ধ্রুবতারার মত দেখে আমি আমার চলার পথ ঠিক থাকছে কিনা তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি, ঠিক যেমনভাবে মাঝ সমুদ্রে নাবিক আকাশে ধ্রুবতারাকে দেখে দিক্ নির্ধারণ করে।

আমার এরকম দেবতা সদৃশ বাবা-মার সেবা আমি করলাম না কেন? যখন মনকে যাচাই করার চেষ্টা করি, তখন বুঝি যে আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে, অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে— ডাক্তারজী যেমন বলেছিলেন সেই সংঘের ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল। তখন বাবা-মা, পরিবারের প্রতি কোন কর্তব্যই আমার কর্তব্য বলে মনে হয়নি। বিপ্লবীদের ধারা অনুসরণ করে শুধু দেশ মায়ের প্রতি কর্তব্য করাটাকেই কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। তার জন্য কোন আপশোষ নেই। তবু মনে হয়— মা-বাবার সেবা করতে পারলাম না— সেজন্য মা-বাবার মনে যদি কোন কষ্ট হয়ে থাকে (তাঁরা কোনদিন সেকথা প্রকাশ করেন নি) সে পাপ আমার কোনদিন মুছবে না।

তাই আজ আমার মনে হয়, যে যতই দেশের সেবা করুক, ধর্মের কাজ করুক, মা-বাবার সেবা করা থেকে কেউ যেন বিরত না হয়। মা-বাবার সেবা করাও অনেক বড় ধর্ম। তা শুধু সন্তানের কর্তব্যই নয়, তা শুধু পারিবারিক কর্তব্যই নয়, তা হল ভারতীয় হিন্দু বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখা। এই বৈশিষ্ট্যই বিশ্ব-মানবতার সঠিক আদর্শ হবে। মা-বাবার প্রতি কর্তব্য আমাদের পরিবারকে ধরে রাখবে। পরিবার থাকলে সমাজ থাকবে। সমাজ থাকলেই মানুষ থাকবে। সমাজ না থাকলে মানুষ মানুষের মাংস খাবে। তাই মা-বাবার সেবা করা শুধু সন্তানের কর্তব্য নয়, তা বিশ্ব মানবতা রক্ষায়ও আমাদের সকলের কর্তব্য।

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গোহত্যা হল ছোট মহড়া গ্রামে

গত ২৮শে নভেম্বর ঈদ উপলক্ষে হাওড়া জেলার আমতার সিরাজবাটী অঞ্চলের অন্তর্গত ছোট মহড়া গ্রামে যেখানে কোনদিন গোহত্যা হয়নি সেখানে সরকারী আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ১২-১৫টি গোহত্যা হয়। অথচ ঈদের আগের দিন বি. ডি. ও. অফিসে থানা কমিটিকে নিয়ে এবং স্থানীয় নেতাদের নিয়ে ঠিক হয় যে নূতন কোন জায়গাতে গোহত্যা হবে না। বি. ডি. ও. সাহেব সঞ্জয় মুখার্জী সেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। তা সত্ত্বেও কি করে পরের দিন নূতন জায়গাতে এতগুলো গোহত্যা হল। ছোট মহড়া গ্রামে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে। হিন্দুরা বুঝতে পারেনি যে এখানে এত গোহত্যা হবে। যখন জানতে পারে থানায় জানালে থানা মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনী পাঠায়। মুসলমানদের বেআইনী কার্যকলাপ রোধে কোন ব্যবস্থায় নেয়নি। হিন্দু মুসলমান ঐ এলাকায় পাশাপাশি বাস করে, ফলে ঐ সমস্ত গরুর হাড় কুকুরে টেনে হিন্দুদের বাড়ী এবং ঠাকুর মন্দিরে ফেলছে। প্রশাসনিক ও পুলিশী মদতে বেআইনী গোহত্যা হিন্দু জনমানসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

আগামী কাল অন্যরকম হতে পারে

১৯৬২ চীনা আক্রমণের লজ্জাজনক স্মৃতি

চীনের ভারত আক্রমণের ৩৫ বছর বাদে ১৯৯৬ সালে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার চিৎরঞ্জন সাবন্ত নেফার (বর্ত্তমান অরুণাচল প্রদেশ) ঢোলার পার্বত্য গিরিখাতের যেদিক থেকে চীনা বাহিনী ভারতে প্রবেশ করেছিল সেই এলাকায় যান। সেখানে এক চীনা অফিসার কথার খোঁচায় জিজ্ঞাসা করেন ১৯৬২ সালে আমাদের কোথায় দেখেছিলেন? প্রত্যুত্তরে বিগ্রেডিয়ার সাবন্ত হাল্কা হাসিতে বলেন, 'এই এখানে, ওখানে, সর্বত্রই।' সেই রাত্রে '৬২ সালের পরাজয়ের স্মৃতিতে ছটফট করতে করতে অবশেষে শোয়ার সময়ে তাঁর স্বগত উক্তি— 'আগামী কাল অন্যরকম হতে পারে।' বলার পরে তিনি ঘুমানোর চেষ্টা করেন।

আশাবাদী ব্রিগেডিয়ারের স্বগত উক্তির সাথে সত্যি কি আমরাও তা বলতে পারি? মনে হয় না। ২০শে অক্টোবর, ১৯২২ সালে চীনা সেনারা সেলা-বইলাডিলা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় তেজপুরের দোরগোড়ায় নেমে এসেছিল। অক্ষরতঃ ভীত, পর্যুদস্ত ভারতীয় সেনাপতিরা। প্রায় সঠিক তথ্য হল— ভারতীয় তালপাতার (সাধারণ বন্দুকধারী) সেপাই, কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে সাধারণ নিম্নমানের পোষাক, অ-প্রশিক্ষিত সেনারা ধরা পড়ে ভেড়ার পালের মতো। ভারত সরকার ও সেনাধ্যক্ষেরা 'হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই' নেশায় ছিল আচ্ছন্ন। সাম্যবাদ পন্থী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের চরম উপেক্ষা ও নিজ পকেট ভরানোর তাগিদে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছাখোলা অবস্থা। তেজপুর এলাকার ভারপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ (নেহরু পরিবার ঘনিষ্ঠ) লেঃ জেঃ বি. এম. কাউল রণাঙ্গনে এসে মিলিটারী প্ল্যানিং করার পরিবর্তে ঐ মরণ-বাঁচন যুদ্ধের দিনগুলি কাটালেন গলার ব্যথা পরীক্ষা করতে দিল্লীর নার্সিং হোমে। প্রায় দশ বছর ধরে ভারত-তিব্বত-লাদাখ প্রভৃতি এলাকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পাহাড়ী ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য রীতিমত প্রস্তুত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া চীনা সৈন্য-স্রোতের সামনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিল একেবারেই বিপর্যস্ত। অপ্রস্তুত ভারত সরকার, ততোধিক অপ্রস্তুত সেনাকর্তারা। চীনাদের রণকৌশল তাদের যত না জিতিয়েছে তার চেয়ে ভারতের কম্যান্ডিং অফিসারদের ও প্রতিরক্ষা বিভাগের হেরে বসা মানসিকতা চীনাদের সাহায্য করেছে অনেক বেশী। ব্রিগেডিয়ার জন দালভী তো সত্যি সত্যি প্যান্ট-খোলা অবস্থায় বন্দী হন। চীনা সেনাদের অনুপস্থিতিতেও কেবলমাত্র গুজব শুনেই আমাদের কম্যাণ্ডিং জেনারেলরা তাঁদের দলের জওয়ানদের একলা ফেলে পালিয়ে আসার জন্যই চীনারা এত তাড়াতাড়ি তেজপুরের দোরগোড়ায় এসে পড়তে পেরেছিল। সাধারণ সেনাদের খাদ্য-বস্ত্র এবং অস্ত্রের সরবরাহকে পেছনে ফেলে অফিসারদের জন্য কমোড জাতীয় দ্রব্যাদি বহনের জন্য পাহাড়ি এলাকায় খচ্চরাদির সাহায্য লওয়াটাই প্রাধান্য পেয়েছিল।

১লা অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে চীন স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই চীন তার আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়েছে। ১৯৫০ সালেই তারা তিব্বত প্রায় দখল করে আর তিব্বত থেকেই ভারত সরকার তার মিশন অফিস, তার ডাকঘর এমনকি তার রাষ্ট্রীয় পতাকাও গুটিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তবুও আমরা চীনের বদমাইশি বুঝতে পারিনি! এত প্রতিকূলতার মধ্যেও আশার আলো দেখিয়ে গেছেন শত শত জওয়ান যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু মান দেন নি। বন্দুকের শেষ গুলি আর শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার ইতিহাসও গড়ে তুলেছেন কিছু সেনা। আত্মসমর্পণকারী সেনারা কেহই তাঁদের বন্দুক ফেলে পালিয়ে আসেনি। আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে এ এক গৌরবজনক, বীরত্বব্যঞ্জক নিদর্শন। সেলা (এলাকার নাম) — ব্রিগেডের কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার হোসিয়ার সিং তাঁর বমডিলার হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও তাঁর শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়েছিলেন, চীনাদেরও রক্তের স্বাদ বুঝিয়ে দেন। সুবেদার যোগীন্দর সিং তো তাঁর বুকের রক্ত ঢেলে ঐ অসমযুদ্ধে যে সাহসের সাথে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাতে তাঁকে দেওয়া ভারতের সর্বোচ্চ পরমবীর চক্র পুরস্কার (মরণোত্তর)ও তুচ্ছ।

আর ঢোলা-সেলা-বমডিলা এলাকার সেলাটপের দায়িত্বে থাকা সিপাহী (পরে নাইক) যশোবন্ত সিংয়ের আত্মবলিদানের কথা না বললে তো কিছুই বলা হল না। গাড়োয়াল রাইফেলসের চতুর্থ ব্যাটেলিয়ানের এই বীর জওয়ান হাতে কেবল একটি লাইট মেশিনগান নিয়ে সেলাটপের

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

ভারতে মুসলমানদের সম্বন্ধে

ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর কি বলেছেন ?

মুসলমানদের নীতিই হল নিজ স্বার্থের জন্য হিন্দুর দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। হিন্দু কোন বিষয়ে আপত্তি করলে মুসলমান নাছোড়বান্দা। হিন্দু যদি বিনিময়ে অন্য কোন সুবিধা দিতে সম্মত হয় কেবল তখনই মুসলমান তার (অন্যায্য) দাবি ত্যাগ করে। উদাহরণ স্বরূপ স্বতন্ত্র বা সংযুক্ত যুগ্ম নির্বাচকমণ্ডলীর বিষয়টি উল্লেখ্য। যে সকল প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘু সেখানে যুগ্ম নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য হিন্দুর আন্দোলন দাবি আমার বিচারে চূড়ান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। যুগ্ম নির্বাচমকণ্ডলী কখনই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিরূপে যথেষ্ট নয়।

আর একটি উদাহরণ হল গো-হত্যা করা এবং মসজিদের সামনে সংগীত নিষিদ্ধ করার জন্য মুসলমানের পীড়াপীড়ি ও জেদ। ইসলামি আইনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গোহত্যা করার কোন বিধান নেই। কোন মুসলমান হজে গিয়ে মক্কা মদিনায় গো-হত্যা করে না। কিন্তু এদেশে অন্য কোন জীব উৎসর্গে তারা সম্মত নয়। কোন মুসলিম দেশেই মসজিদের সামনে সংগীতে কোন বাধা নেই। এমনকি আফগানিস্তান— যে দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ নয়– সেখানেও মসজিদের সামনে সংগীত নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ভারতে মসজিদের সামনে সংগীতে মুসলমানের প্রবল আপত্তি। কারণ একটাই, যেহেতু এ হিন্দুর দাবি।

তৃতীয় লক্ষ্যণীয় জিনিস হল রাজনীতিতে মুসলমানের সশস্ত্র দুর্বৃত্তায়নের পথ গ্রহণ। উপর্যুপরি হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা প্রমাণ করে যে সশস্ত্র দুর্বৃত্তায়ন (Gangsterism) তাদের রাজনৈতিক রণকৌশলের মূল ভিত্তি ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। তারা সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবেই চেকদের বিরুদ্ধে সুডেটান জার্মানদের অনুসৃত পথ গ্রহণ করেছে। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান ছিল আগ্রাসী—হিন্দু শান্ত, নিরীহ; দাঙ্গায় সব সময়েই তারা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু সে অবস্থা আর নেই। হিন্দুও প্রতিশোধ নিতে শিখেছে। (আক্রান্ত হলে) মুসলমানের পেটে ছুরি চালাতে সে কোন অনুশোচনা বোধ করে না। এই প্রতিশোধ নেওয়ার সাহস তৈরী করবে দুর্বৃত্তায়নের মোকাবিলার বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তায়নের বিপজ্জনক অবস্থা। এর সমাধান কোন পথে সে সম্বন্ধে সকলেরই ভাবা উচিত।

আমার মনে হয় কংগ্রেস দুটি বিষয় বুঝতে পারেনি। প্রথমটি হল, তোষণ ও মীমাংসার মধ্যে যে অপরিহার্য পার্থক্য আছে কংগ্রেস তা বুঝতে পারছে না। আক্রমণকারী দ্বারা ধর্ষণ, খুন, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ জাতীয় কাজকে গোপনে প্রশ্রয় (দুষ্কৃতিদের অব্যাহতি ইত্যাদি) দেওয়াকে বলা হয় তোষণ। অপরদিকে মীমাংসা হল সীমারেখা নির্দ্ধারণ করে দেওয়া যা কোন পক্ষই লঙ্ঘন করতে পারবে না। তোষণ কখনও অত্যাচারী আক্রমণকারীর দাবি ও উচ্চাশাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মীমাংসা দ্বারা তা সম্ভব। দ্বিতীয় যে বিষয়টি কংগ্রেস বুঝতে পারছে না তা হল এই তোষণ বা সুবিধাদানের নীতি-মুসলমানের আগ্রাসী মনোভাবকে শক্তিশালী করছে। এবং সবচেয়ে আরও খারাপ দিক হল এই যে, মুসলমানরা মনে করছে যে, হিন্দু ''পরাজিতের মানসিকতায়'' ভুগছে এবং প্রতিরোধের ইচ্ছাও হারিয়ে ফেলেছে। হিটলারকে তোষণ করে মিত্রশক্তি যে ভীতিপ্রদ অবস্থার মধ্যে পড়েছিল; মুসলমানের প্রতি ''তোষণ নীতি'' গ্রহণের ফলে হিন্দুকেও অনুরূপ সঙ্কটে পড়তে হবে। সামাজিক পরিবর্তনহীনতা অপেক্ষা ইহা কম অস্বস্তিকর নয়। তোষণ নীতি নিশ্চিতভাবেই সমস্যাকে আরও গুরুতর করবে। একমাত্র সমাধান হল মীমাংসা। এই মীমাংসা যদি হয় পাকিস্তান, তবে তা বিবেচনার যোগ্য। (বিরোধের) মীমাংসা হলে আর তোষণের প্রয়োজন হবে না। মুসলমানের ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক দাবির ফলে হিন্দুর ''নিরাপত্তাহীনতা'' অপেক্ষা যারা শান্তি ও স্থিতিকে অগ্রাধিকার দেন— তাঁদের এই প্রস্তাবকে (পাকিস্তান দাবি) স্বাগত জানানো উচিত।

[Dr. B.R. Ambedkar Writings and Speeches, Vol. 8, Page– 268, 269, 270]

তৃতীয় পাতার শেষাংশ

আগামী কাল অন্যরকম হতে পারে....

এক বাঁকে শেষ পর্যন্ত একাই রুখে ছিলেন চীনা ফৌজের মৌমাছি ঝাঁকের আক্রমণ। শেষ বুলেট, শেষ রক্ত খরচ করে সহযোগী সেনারা সকলেই আশ্রয় নিয়েছিল ধরণীর বুকে। তিনিই 'একা কুম্ভ'। চীনা সেনাদের লাশের পাহাড় পেরিয়ে আসতে থাকে আরও চীনা। যশোবন্ত সিং-এর দেহ পাওয়া যায় নি। স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই তাঁকে 'ক্যাপ্টেন' পদমর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তিনি আজও পাহাড়ে 'ক্যাপ্টেন সাহেব'। পল্টনে (ব্যাটেলিয়ান) আজও তিনি জীবিত, তাঁর নামের পূর্বে কেউ 'স্বর্গতঃ' বলেন না। সেই সেলা-টপের পোষ্টিং ইউনিটে আজও তাঁর জন্য বিছানা পাতা হয়, পাশে রাখা হয় রাতের খাবার। চীনা-সেনাদের তাড়িয়ে যে কোনও সময়ে হয়তো এসে পড়বেন তাঁদের 'ক্যাপ্টেন সাহেব'।

সেই দুঃস্বপ্নের রাতের পর বহু দিন কেটেছে। এসেছে নতুন সকাল। নতুন দিনে অন্যরকম সকালের অপেক্ষায় ভারত। সচেতন, সতর্ক ভারত কি সত্যিই? না কি ১৯৬২-র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির পথ চেয়ে বসে থাকা।

[অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার চিৎরঞ্জন সাবান্ত '৬২ যুদ্ধে লাদাখে ছিলেন। চীনা ভাষা ও নীতি বিশেষজ্ঞ। তাঁর লেখা 'রিমেমবারিং এ ওয়ার' থেকে প্রস্তুত।]

সন্ত্রাসবাদের উৎস কোথায় ?

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশভাগের পর থেকেই ভারতে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়েছিল কাশ্মীরে, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদ আর শুধুমাত্র ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বর্তমানে এই সন্ত্রাসবাদ একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে। যদিও ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রাসের বীভৎসতম ঘটনা ঘটেছিল নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের যমজ টাওয়ার ধ্বংস করে আর ওয়াশিংটনে পেন্টাগনে আক্রমণ চালিয়ে, তবে এর আগে এবং পরেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং করছেও। এগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকস-এ অলিম্পিক ভিলেজে ইজরাইলের খেলোয়াড়দের ওপর সন্ত্রাসীদের আক্রমণ।

১৯৯২ সালে ডিসেম্বর ইয়েমেনে হোটেলে বম্বিং।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারীতে জর্ডনের প্রিন্স আবদুল্লাকে হত্যা করার চেষ্টা আর ফেব্রুয়ারীতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বম্বিং করে ১৭ জনকে হত্যা।

১৯৯৫ সালে জানুয়ারীতে ফিলিপিন্স-এ পোপকে হত্যার প্রচেষ্টা আর জুন মাসে ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট হোসেনি মুবারককে হত্যার প্রচেষ্টা, নভেম্বর-এ রিয়াধে বম্বিং করে ৭জন আমেরিকানকে হত্যা আর পাকিস্তানের ইজিপ্ট এমব্যাসিতে বম্বিং করে ১৭ জনকে হত্যা।

১৯৯৮ সালে কেনিয়া নাইরোবি এবং তানজানিয়ার আমেরিকার এমব্যসিতে বম্বিং করে ২৫৭ জনকে হত্যা।

২০০০ সালে ইয়েমেনে যুদ্ধজাহাজ U.S.S. Cole-এর ওপর আক্রমণ।

২০০২ সালে রাশিয়ার মস্কো থিয়েটারে ঘটেছিল চেচনিয় সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ।

২০০৪ সালে বেসলানে একটি স্কুলে চেচেন জঙ্গীরা আবার সন্ত্রাস করেছিল, ৩৫০ শিশু ও অভিভাবক হত্যা। সম্প্রতি লণ্ডনের টিউব রেলের সাবওয়েতে ছ জায়গায় আর একটি বাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

ভারতেও বহু সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটেছে। ১৯৯৩ সালে ১২ মার্চ মুম্বাই-এ একাধিক স্থানে প্রায় একই সময় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। এরপর ১৯৯৮-এ কোয়েম্বাটুরে লালকৃষ্ণ আদবানিকে হত্যার পরিকল্পনায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। ২০০১ সালে শ্রীনগরে বিধানসভা ভবন, দিল্লীতে সংসদ ভবন, ২০০২ সালে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে, জম্মুতে রঘুনাথ মন্দির, গান্ধীনগরে অক্ষরধাম মন্দির-এ জঙ্গী হামলার ঘটনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সন্ত্রাসবাদীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেও তারা একই সম্প্রদায়ের। তারা প্রত্যেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এর কারণ এটাই যে এরা সবাই জেহাদি। ইসলাম ধর্মের মূল বক্তব্য হল সমস্ত পৃথিবীটা আল্লার সাম্রাজ্য। আল্লার এই সাম্রাজ্যে যেখানে আল্লার শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করাই একজন সাচ্চা মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য। এই পবিত্র কর্ত্তব্যের জন্য যে ধর্মযুদ্ধ তাকে বলে জেহাদ। আর এই জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের বলে জেহাদি। এই জেহাদে অংশগ্রহণকারী কোন জেহাদির মৃত্যু ঘটলে আল্লা তাকে বেহেস্তে স্থান দেন। সেখানে সে পরম সুখে কালাতিপাত করে। কোরানে বেহেস্তের যে মনোরম বর্ণনা রয়েছে সেটাই জেহাদি বা আত্মঘাতী ফিঁদায়ে বাহিনীর অনুপ্রেরণা। তাই কোরাণে বর্ণিত বেহেস্তের মনোরম বিবরণের কিছুটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—''তারা স্বর্ণখচিত আসনে (বসবে) ওরা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে, তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোরীরা। পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, সেই সুরাপানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না। ওরা পরিবেশন করবে তাদের পছন্দমত ফলমূল এবং তাদের ঈপ্সিত পাখীর মাংস, সেখানে তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর, তারা দেখতে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ (৫৬/১৬-২৪)। সেখানে থাকবে আয়ত নয়না তরুণীগণ, তাদের পূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি (৫৫/৫৬) তাদের জন্য থাকবে সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী, ওদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। ওদের করেছি চিরকুমারী সোহাগিণী ও সমবয়স্কা (৫৬/৩৪-৩৭) ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে বেহেস্ত হচ্ছে এক ভোগভূমি। মৃত্যুর পর বেহেস্তে রাখা হয়েছে অপরিমিত যৌন সম্ভোগের ব্যবস্থা, যা লঘুমতি মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। পৃথিবীতে যত রকম ভোগ্যসামগ্রী আছে বেহেস্তে তার সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। দিনের পর দিন এরকম ভোগবাদের হাতছানিকে উপেক্ষা করা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? তাই মাদ্রাসা মক্তবে পড়া শুধুমাত্র অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মুসলমানরাই যে জেহাদী হয় তা নয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরাও কম জেহাদী নয়। ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর যে আত্মঘাতী ফিঁদায়ে বাহিনী প্লেন হাইজ্যাক করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা চালিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল তারা প্রত্যেকেই ছিল উচ্চশিক্ষিত। তবুও তারা বিশ্বাস করত আল্লা তাদের বেহেস্তে স্থান দেবেন। সেখানে তারা অপরিমিত যৌনসুখ ভোগ করতে পারবে।

তাই যত মাদ্রাসা মক্তব তৈরী হবে, ততই মাদ্রাসা মক্তবে পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়বে আর ততই জেহাদী আর ফিঁদায়েদের সংখ্যা বাড়বে। দেশে বিদেশে বেড়ে চলবে সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা সন্ত্রাস। হাজার হাজার মানুষ নিহত হবে নয়ত পঙ্গু হবে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হবে। তাই সন্ত্রাসবাদীকে রুখতে হলে মাদ্রাসা মক্তবের শিক্ষা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com